রবীন্দ্রনাথ এবং অসম

বাসুদেব দাস

(২০১১ সনের এপ্রিল মাসের ১২ এবং ১৩ তারিখ The Rabindranath Tagore Centre for Human development Studies ,Kolkata কর্তৃক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত দুদিনের সেমিনারে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত হই । আমার বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথ এবং অসম'। এই প্রবন্ধটি তারই মার্জিত রূপ)

অসমের জনজীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভ্রভেদী মহত্ব নিয়ে আজও প্রতিষ্ঠিত। অসমের বিখ্যাত বেজবরুয়া পরিবারের রসরাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সঙ্গে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রজ্ঞাসুন্দরীর বিয়ে হয়েছিল। পরবর্তীকালে জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী লতিকা ঠাকুরের বিয়ে হয়। ঠাকুর পরিবারের এই দুই জামাতার পাশাপাশি ওই পরিবারের বধূ হয়েছিলেন একজন অসমিয়া মহিলা। তিনি বিখ্যাত অসমিয়া সাময়িক পত্রিকা 'আবাহন'এর প্রতিষ্ঠাতা সমপাদক ডঃ দীননাথ শর্মার কন্যা তথা সঙ্গীত শিল্পী দিলীপ শর্মার বোন আরতি শর্মা (ঠাকুর)। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯,১৯২৩,এবং ১৯২৭ সালে তিন তিনবার অসম ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় অসমের বিভিন্ন সাহিত্যিক এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবির ভাব বিনিময় হয় এবং তাঁদের পরবর্তী জীবনে কবির আলোকসামান্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

অসমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সমপর্কটি বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে তৎ কালীন অসমের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থান সমপর্কে একটি সম্যক ধারণা থাকা প্রযোজন । তখনকার অসমের ভৌগোলিক রূপটিও ছিল আজকের অসম থেকে অনেকটাই বড়। শ্রীহট্ট জেলা তখন বৃহত্তর অসমের অর্ন্তভুক্ত ছিল। আজকের মেঘালয় রাজ্যের তখন কোনো রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না। বৃহত্তর অসমের রাজধানী ছিল শিলঙ। ১৮২৬ সনে ইযাণ্ডাবুর সন্ধির মাধ্যমে অসম ইংরেজ রাজত্বের অধীনে আসে। এর ঠিক দশ বছর পর ১৮৩৬ সনে ইংরেজ সরকার অসমের বিদ্যালয় এবং প্রশাসনের কাজে বাংলা ভাষার প্রচলন করে। প্রশাসনীয় কাজ কর্মে সুবিধের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোমপানি ব্যাপক হারে বঙ্গদেশ থেকে কর্মচারীদের নিযুক্ত করে। ১৮৩৬ সনে অসমে বাংলা ভাষা প্রচলনের যে প্রস্তাব গৃহীত এবং কার্যকরী করা হয়েছিল তা অনেকের মতে বাঙালি আমলাদের ষড়যন্ত্রের ফলে স ব হয়েছিল। তবে 'ইতিহাস আচার্য'হেরম্বকান্ত বরপূজারী থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের অনেক অসমিয়া চিন্তাবিদরাই (প্রসেনজিৎ চৌধুরী,শিবনাথ বর্মন এবং পরমানন্দ মজুমদার) যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে এই পরিস্থিতির জন্য বাঙালি আমলাদের পুরোপুরি দায়ী করা ঠিক নয়। ইংরেজদের কুটচাল এবং একশ্রেণীর শিক্ষিত অসমিয়ার বাংলাভাষা প্রীতিই এর জন্য দায়ী। ১৮৭২ সনে অসমিয়া ভাষা তাঁর স্বীয় মর্যাদা ফিরে পায়। অসমিয়া ভাষার এই পুনঃপ্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন এবং আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন।

১৯০১ সনে গুয়াহাটি শহরে কটন কলেজ স্থাপিত হয়। তাই এর আগে স্বাভাবিকভাবেই অসমিয়া ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতায় ছুটে আসতে হত। এভাবেই একদিন কলকাতায় পড়াশোনা করতে আসা কয়েকটি অসমিয়া যুবকের দ্বারা ১৮৭২ সনে 'অসমীয়া সাহিত্যসভা' বা 'অসমীয়া ছাত্রর সাহিত্যসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ সনের ২৫ আগস্ট ,জন্মাষ্টমী তিথিতে সদস্যরা এই সভা ভঙ্গ করে ৬৭ মির্জাপুর স্ট্রীটে 'কলিকাতা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা'প্রতিষ্ঠা করেন। রজনীকান্ত বরদলৈ,বিনন্দি চন্দ্র ফুকন,হেমচন্দ্র গোস্বামী,দ্বারিকেশ্বর শর্মা,তীর্থনাথ কাকতি,লক্ষ্মীপ্রসাদ বরুয়া,বিষ্ণুপ্রসাদ আগরওয়ালা ,চন্দ্রকুমার বরুয়া ,কনকলাল বরুয়া,হরকান্ত চৌধুরী কৃষ্ণকুমার বরুয়া,চন্দ্রকমল বেজবরুয়া,কমলচন্দ্র শর্মা এবং যজ্ঞেশ্বর শর্মা নেওগ এঁরা সবাই সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৯ সনের ১৩ জানুয়ারি সভার মুখপত্র 'জোনাকী'প্রকাশিত হয়। মূলত চন্দ্রকুমার আগওয়ালা,হেমচন্দ্র গোস্বামী এবং লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার প্রচেষ্টাতেই 'জোনাকী'র জয়যাত্রা শুরু হয়। মাসিক 'জোনাকী'র সমপাদক,প্রকাশক এবং স্বত্বধিকারী ছিলেন যুবক চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মধুসূদন কাব্যক্ষেত্রে আর বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তার অনুসরণে বাংলা,অসিময়া ,হিন্দি এবং ওড়িয়া সাহিত্যে আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছিল। মধুসূদন -অনুপ্রাণিত অসমের অমিতাক্ষর। ভোলানাথ দাস মধুসূদনের অমিতাক্ষর অসমিয়াতে প্রবাহিত করতে চেয়ে 'সীতাহরণ কাব্য'লিখেন। --

লক্ষ্মণ সীতার সহ পিতৃসত্য পালি
দাশরথি রঘুপতি পঞ্চবটী বনে,
তপস্বীর বেশে ভক্ষি বন্য ফল মূল
তপস্বী আহার যবে ছিলা বনবাসে। ....
কি ছন্দে গাইলা --বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে,অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন,বঙ্গ কবিকুলমণি,
অতি দুরাকাঙ্খা কিন্তু করিছোঁ মনত,
হীন আমি শ্বেতভুজে !

রমাকান্ত চৌধুরীও মধুসূদনের আদর্শে 'অভিমন্যুবধ কাব্য'রচনা করেন। মধুসূদনের অনুবর্তী কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব অসমিয়া ভাষায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করে লেখেন--

উঠা অসমীয়া চোৱা চকু মেলি
এলাহ পাটীত নে লাগে লাজ
কঙ্গালি টোপনি ভাঙ্গি উঠি বহা

পেলোৱা পেলোৱা টোকোনা সাজ।

পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়া ছিলেন একাধারে নাট্যকার ও কবি। মধুসূদন,গিরিশচন্দ্র,দ্বিজেন্দ্রলাল,রবীন্দ্রনাথ--এঁদের আদর্শ ও প্রভাব গোহাঞিবরুয়ার রচনায় স্পষ্টভা লক্ষ্য করা যায়। নাটকে ও কবিতায় বাংলার সঙ্গে অসমের যে যোগ,গদ্যের ক্ষেত্রে সে যোগাযোগ ছিল আরো গভীর। ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত চক্রবর্তী' অসমিয়া সাহিত্যে 'কৃপাবর বরুয়া' নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর'এর অনুসরণে সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া 'বরবরুৱাৰ বুৰবুৰানি' রচনা করেন। অসমিয়াতে উপন্যাসের সূত্রপাত হয় বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত রজনীকান্ত বরদলৈর হাতে। এ সমপর্কে Dr,B Barua তাঁর 'Assamese literature'গ্রন্থে বলেন --'The novel as a full-fledged work of creative imagination in prose was born at the hands of Rajanikanta Baradoloi.Baradoloi admits in the preface to his novel ,' Danduuwa Droh'(1909),that the works of Walter Scott and Bankim Chandra Chatterjee moved him to appreciate the beauty of the hills and the and dales of his own land and to write on themes called from Assams history.'

প্রাক-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই প্রবল অনুরাগ ও ভালোবাসাই পরবর্তীকালে অসমে রবীন্দ্র প্রতিভার ব্যাপক অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তুলেছিল।

১৮৯১ সনের ১১ই মার্চ বুধবার রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর সঙ্গে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার বিয়ে হয়। অসমিয়া সমাজে যৌতুকের প্রচলন নেই বলে কন্যার বাড়ি থেকে বরকে যৌতুক দেবার প্রস্তাবকে দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্মীনাথ প্রত্যাখান করেন। লক্ষ্মীনাথের এই সুবিবেচনা এবং নির্লোভ আচরণ ঠাকুর পরিবারের সবাইকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। বেজবরুয়া তাঁর আত্মজীবনী 'মোর জীবন সোঁৱৰণ' এ লিখেছেন --'মোৰ বিয়াৰ ছমাহমানৰ পিছত এদিন কলিকতাত মোৰ গুৰুদেব চন্দ্রমোহন গোস্বামী হেডমাস্টাৰৰ সৈতে দেখা হৈছিল। তেঁও মোক মৰমকৈ কৈছিল --'তুমি ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে করেছ ,আমি খুব খুসী হয়েছি । কিন্তু নিজের বংশের সম্মান ঠিক রেখে চলো। তুমি তাদের বলে দিও--তোমরা যেমন বেঙ্গলে বড়লোক,আমরাও আসামে তেমন। কোনো বিষয়েই হীনতা স্বীকার করো না। গুৰুদেবক কৃতজ্ঞতা জনাই প্রণাম কৰিলোঁ। ওখ শাৰীৰ বঙ্গালীৰ অন্তঃকৰণ কেনে মহৎ। (পৃ-১৭৯-১৮০)লক্ষ্মীনাথের বিয়ের চারদিন পরে বহুমুখী প্রতিভাধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্মীনাথের একটি স্কেচ এঁকেছিলেন। সেই ছবি কলকাতার রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীরও কয়েকটি ছবি এঁকেছিলেন। ঠাকুরপরিবারের নাট্যাভিনয়ের প্রভাব লক্ষ্মীনাথের জীবনেও পড়েছিল। কন্যা অরুণার সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 'বাল্মীকি প্রতিভা'অভিনয়ের মাধ্যমে লক্ষ্মীনাথ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কলকাতার রয়েল থিয়েটারের অভিনয়ে লক্ষ্মীনাথ ছিলেন দস্যু সর্দারের ভূমিকায়,বনদেবীর ভূমিকায় ছিলেন অরুণা। বাংলা এবং ইংরেজি পত্র পত্রিকায় তাঁদের অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়েছিল। সম্বলপুরের ভিক্টোরিয়া টাউন হলে দুবার লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'অভিনয়

করেছিলেন। এতে দস্যু সর্দারের ভূমিকায় লক্ষ্মীনাথ নিজেই অভিনয় করেছিলেন। ১৯১২ সনের ১২ মার্চ শুক্রবার হাইকোর্টের জজ আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে লেডি হার্ডিঞ্জের সম্বর্ধনা উপলক্ষে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনীত হয়। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্মীকির অভিনয় করেন। আশুতোষ চৌধুরীর কন্যা অশোকা সরস্বতী,ব্যারিস্টার মুখার্জির পত্নী (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) শোভনা দেবী লক্ষ্মী,জ্ঞানদাভিরামের পত্নী লতিকা দেবী এবং লক্ষ্মীনাথের দুই কন্যা অরুণা এবং রত্নাবলী বনদেবী এবং ডাক্তার সুহৃৎ চৌধুরী দস্যুর চরিত্রে অভিনয় করেন।'বাল্মীকি প্রতিভার' প্রসঙ্গ উঠলেই রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। কেবল সঙ্গীত বা নাটকের সূত্রেই নয়,এমিনতেও দিনেন্দ্রনাথ এবং লক্ষ্মীনাথের মধ্যে ব্যক্তিগত সখ্যতার সমপর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৫ সনে কলকাতায় দিনেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু হয়। এই খবর শুনে দুঃখিত অন্তরে কন্যা অরুণাকে লক্ষ্মীনাথ লিখছেন --'দিনুটা মারা গেল ,আমার চেয়ে কত বয়সে ছোট।'

লক্ষ্মীনাথের তিনমেয়ে--অরুণা,রত্না এবং দীপিকা। অরুণার স্বামী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় এবং রত্নার স্বামী রোহিনীকুমার বরুয়া। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে দীপিকা সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। লক্ষ্মীনাথের প্রথম সন্তান সুরভির মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। জোড়াসাঁকোর শ্বশুর বাড়িতে কন্যাকে হারিয়ে লক্ষ্মীনাথ গভীর শোকে মগ্ন হয়েছিলেন। সুরভিকে তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ভাষাবিচ্ছেদ' প্রবন্ধ নিয়ে অসমিয়া জনমানসে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রবন্ধে কবি অসমিয়া ভাষাকে বাংলারই একটি উপভাষা বলে দাবি করেছিলেন। প্রবন্ধটি রচিত হওয়ার সময় কবির বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বছর। এরপর তিনি আরো ৪৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়কালে কবি অনেকবার তাঁর পূর্বের ধারনা থেকে সরে এসে অসমিয়া ভাষার স্বাতন্ত্র ও ব্যাকরণের বৈশিষ্টকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্তব্য করার নিদর্শন রয়েছে। ১৯৩৮ সনের ২৬ মার্চ সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মৃত্যু হলে চারপাশে শোকের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মীনাথের বিরাট প্রতিভার সান্নিধ্য লাভ করা রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সনের ৩১ আগস্ট শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে প্রয়াত রসরাজের স্মৃতিতে লেখেন--'ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে তাহার আপন ভাষার পূর্ণ ঐশ্বর্য উদ্ভাবিত হইলে তবেই পরস্পরের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের দান-প্রতিদান সার্থক হইতে পারিবে এবং সেই উপলক্ষ্যেই শ্রদ্ধা-সমন্বিত ঐক্যের সেতু প্রতিষ্ঠিত হইবে। জীবনে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার এই সাধনা অতন্দ্রিত ছিল,মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাঁহার এই প্রভাব বল লাভ করুক এই কামনা করি।'

অসমের প্রবাদপুরুষ গুণাভিরাম বরুয়া।তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন।কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের ঐতিহাসিক বিধবা বিবাহ সভায় গুণাভিরাম উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের আদর্শে তিনি প্রথমা পত্নী ব্রজসুন্দরীর মৃত্যুর পরে বিধবা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিয়ে করেন। এটি ছিল অসমিয়া সমাজ জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে বলা যেতে পারে যে গুণাভিরামের কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গুণাভিরামের বিধবা বিয়ের

কথা জানতে পেরে শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব খারিজ করে দেন। এহেন গুণাভিরাম বরুয়ার কনিষ্ঠ সন্তান জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার সঙ্গে ১৯০৬ সনের ১ জুলাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী এবং অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা লতিকার বিয়ে হয়। জ্ঞানদাভিরামের প্রথম পর্বের শিক্ষা কলকাতায়,দ্বিতীয় পর্ব বিলেতে। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে ১৯১৪ সনে গুয়াহাটিতে স্যার (অসমের চীফ কমিশনার ১৯১১-১৭) আর্সডেল আর্লের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অসমের প্রথম আইন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন। জ্ঞানদাভিরামের যে কত বাঙ্গালি বন্ধু দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। লক্ষ্মীনাথের মতো তিনিও ছিলেন অসমিয়া ভাষার হিতৈষী। উড়িষ্যা থেকে প্রকাশিত 'মৃন্ময়ী'নামে পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি যখন বাংলা এবং অসমিয়ার অভিন্নতা সমপর্কে উদ্ভট মন্তব্য করেছিলেন তখন জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া মৃন্ময়ীতে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা তার প্রতিবাদ করেছিলেন। দীর্ঘকাল অসমের বাইরে অ-অসমিয়াদের মধ্যে বসবাস করেও তিনি নিঁখুত অসমিয়া গদ্য রীতি বজায় রেখেছিলেন। ১৯১৯ সনের ৩০ অক্টোবর শিলঙ থেকে ফেরার পথে কবি নাত জামাই জ্ঞানদাভিরামের বাসগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। জ্ঞানদাভিরাম তখন আর্ল ল কলেজের অধ্যক্ষ। দীঘলীপুকুরের পূবদিকে ছিল অধ্যক্ষের বাসভবন। শিলঙ যাবার সময় কবি নাত জামাইকে খবর দিতে পারেন নি,তাই ফেরার সময় তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁদের আনন্দ দানের চেষ্টা করেন। কবিকে কেন্দ্র করে গুণগ্রাহীদের ভিড় বাড়তে শুরু করে। ১ নভেম্বর পানবাজারের জুবিলি পার্কে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কবির অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হয়। জুবিলি পার্কের এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আইন কলেজের অধ্যাপক সাহিত্যসেবী সত্যনাথ বরা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গুয়াহাটি শাখা তখন সংস্কৃতি চর্চার এক অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। পরিষদের সদস্যরা দুই নভেম্বর সকালবেলা কার্জন হলে কবির সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি তারকেশ্বর ভট্টাচার্য। কটন কলেজের অধ্যাপক লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী স্বরচিত সঙ্গীতের মাধ্যমে কবিকে অভ্যর্থনা জানানোর পর সভার পক্ষ থেকে কবির হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। সাহিত্য পরিষদের উপযোগিতা সমপর্কে কবি একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। কবির বক্তৃতার পরে লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় গীতাঞ্জলি থেকে 'উড়িয়ে ধবজা অভ্রভেদী রথে /ওই যে তিনি ,ওই যে বাহির পথে'গানটি গেয়ে শোনান। পরিষদের সমপাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কবিকে একটি গান শোনাতে অনুরোধ করলে কবি গেয়ে শোনান--

অয়ি ভুবনমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজজল ধরণী
জনক জননি জননী।

বিকেল দুটোর সময় গুয়াহাটির মহিলাদের উদ্যোগে আর্ল ল কলেজ প্রাঙ্গণে আরো একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। মহিলাদের অনুরোধ কবি সেখানেও দুটো গান পরিবেশন করেন। শ্রদ্ধা এবং

ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ মহিলারা নিজেদের হাতে বোনা এণ্ডি এবং মুগার কাপড় উপহার দিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা পাণবাজারের ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সামনে গুয়াহাটির ব্রাহ্মসমাজ আয়োজিত শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিসভায় কবি সভাপতিত্ব করেন। এই স্মৃতিসভার একমাস আগে শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। সেদিনের সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মশায়ের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ --প্রবল মানব বৎ সলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

জ্ঞানদাভিরামের ঘরে অসম কেশরী অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী কবিকে মাধবদেব রচিত বরগীত গেয়ে শোনান।কবির সঙ্গে অম্বিকাগিরির সাক্ষাৎ কার কেবলমাত্র গান শোনানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অসমিয়া জাতি এবং ভাষার স্বকীয় বিশিষ্টতা নিয়েও কবির সঙ্গে সেদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল।

১৯১২ সনের ২৮ জানুয়ারি কলকাতার প্রসিদ্ধ টাউন হলে রবীন্দ্র অনুরাগীদের অর্থসাহায্যে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যবস্থাপনায় কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য উৎ সবের আয়োজন করা হয়। এই ঐতিহাসিক সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র গুণমুগ্ধ সূর্যকুমার ভূঞা। সূর্যকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতেই এম.এ করেন। ১৯১৬ সনে শিক্ষকরূপে জোড়হাটের বেজবরুয়া স্কুলে তাঁর চাকরিজীবন শুরু হয়। পরে,১৯১৮ সনে গুয়াহাটির কটন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানের পরদিন অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারি সূর্যকুমার রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ভালো লাগার কথা জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি কবির গল্পের অসমিয়া অনুবাদের অনুমতিও প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সেই অনুমতি দান করেন। এর ঠিক এক বছর দশ মাস পরে ১৯১৩ সনের ১৪ নভেম্বর কবি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দেশ বিদেশ থেকে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে অসংখ্য চিঠিপত্র ,টেলিগ্রাম আসতে থাকে। ১৫ নভেম্বর ৬৪ নং ইডেন হিন্দু হোস্টেল থেকে সূর্যকুমারও কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠিকানায় চিঠি লেখেন। কবি শান্তিনিকেতন থেকে ১৭ নভেম্বর সূর্যকুমারের চিঠির উত্তর দেন। ১৯১৮ সনে সূর্যকুমার রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেন। সেই বছর 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা'র গুয়াহাটি অধিবেশনে তিনি রচনাটি পাঠ করে শোনান। পরবর্তীকালে তা কটন কলেজের ছাত্রদের হাতে লেখা পত্রিকা 'সেউতি 'তে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সনে রচনাটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। বইটিতে কবির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের প্রতি নিষ্ঠাও ফুটে উঠেছে। ১৯১৮ সনের ২৮ এপ্রিল সূর্যকুমার ভূঞা সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে বেলা দেড়টা অবধি কবির সঙ্গে আলাপচারিতায় কাটে। এর প্রায় ৪০ বছর পরে ১৯৫৮ সনে সাক্ষাৎ কারটি সূর্যকুমার লিপিবদ্ধ করেন। এটি তাঁর 'Men I have met' বইয়ে স্থান পেয়েছে। সূর্যকুমার তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'নির্মালি'কবিকে উপহার দেন। সূর্যকুমার যে নিজেকে 'শ্রীভানুনন্দন' বলে পরিচয় দিয়েছেন তার পেছনেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। এখানে তাঁর কবিতা 'মধুযামিনী'থেকে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে--

ভানুনন্দন কহে বিরহী জনক দহে

সঞ্চিত হৃদয় অভিলাষা

খীন জীবন তনু সোহি মুখ ন পেখনু

ধরম সরম সবু নাশা

ন আওল ধনী মধুযামিনী।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'কবিতায় সুদূরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে আকুলতা দেখা যায় সূর্যকুমারের 'উতলা'কবিতায় আমরা তাই প্রতিধ্বনিত হতে দেখি। --

মোর প্রাণত পুলক গঁথা

মোর চকুত নীরব কথা

মোর শূন্য গহীন আত্মা বিয়াপি

কিবা এটা আকুলতা।

রবীন্দ্রনাথ 'বিদেশিনী' প্রসঙ্গে বলেছিলেন , 'আমি আকাশে পাতিয়া কান/শুনেছি শুনেছি তোমারি গান'। সূর্যকুমারও আকাশে কান পেতে না শোনা গান শুনেছেন,সে গানে জীবনসিন্ধুর ওপার হতে মহাসঙ্গীত ভেসে এসেছে।--

মই আকাশত পাতি কান

আজি শুনিছোঁ নু শুনা গান

মোর জীবনসিন্ধু সিপারর পরা

ভাহিছে পুণ্য তান।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কখনও কখনও সূর্যকুমারের কবিতায় 'প্রভু'হয়ে দেখা দিয়েছেন। 'সৃষ্টিপাতনি'কবিতায় প্রভু রুদ্রবীণার ঝঙ্কারে কেমন ভীষণ উ ীপনায় আনন্দে বিশ্বভূমি পরিপূর্ণ করলেন তা বলতে গিয়ে সূর্যকুমার লিখেছেন--

সেই প্রলয়র দিনা

তুমি প্রভু হাতত লঁলা

তোমার রুদ্রবীণা

আনন্দময় না ছিল কোনো

আছিল নিমাত অরুণ জোনো

দিগন্তেদি উঠিল জলি

ভীষণ উদ্দীপনা যিদন তুমি হাতত লঁলা

তোমার রুদ্রবীণা। (সৃষ্টিপাতনি :সূর্যকুমার)

অসমিয়া সাহিত্যের বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রনাথ দুৱরার কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা

যায়। ---

সন্ধিয়াক বাট দেখুৱাই

সুরুযর শেষের কিরণে

হেপাহেরে ধরণীক চুমি

মার খায় পছিমর পিনে।

এই সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর যোগ। আজ এই বিদায়ের দিনে কবির মনে অতীতের সমস্ত ঘটনা ভিড় করে আসে--

আজি এই বিদায়ের দিনা

সকলোটি পড়িছে মনত

সকলোকে করিলোঁ প্রণাম

নাও মোর চলিছে সোঁতত।

এ যেন রবীন্দ্রনাথেরই বেলাশেষের গান। বিদায়ের এ পূরবী রাগিণী রবীন্দ্রনাথের চিত্তবীণা হতে কতবার ঝঙ্কৃত হয়েছে।

যতীন্দ্রনাথের রচনায় যেমন অসমিয়া লিরিকের পূর্ণতা ,পদ্মনাথ গোহাঞিবরুয়ার রচনায় তেমনই অসমিয়া সাহিত্যের সামগ্রিক রূপের প্রকাশ। পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া ছিলেন একাধারে কবি,নাট্যকার এবং গদ্যলেখক। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সনেট এর আদর্শে তিনি সনেট রচনা করেছেন। 'কবি রবীন্দ্রনাথ'সনেটে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি করেছেন---

রবীন্দ্র কবীন্দ্র আজি অমর সভাত,

'বাল্মীকি প্রতিভা'প্রভা প্রকাশি ধরাত ,

কালিদাস পূজা ভাগ স ািগি জীবন্তে

পুষ্প অর্ঘ্য পৃথিবীর লভি অযাচিতে।

সাদরর রবি বাবু --ভারত বিদিত--

প্রতিভা প্রভার গুণে পৃথিবী পূজিত।

রবীন্দ্র প্রভাবিত মহিলা কবিদের মধ্যে নলিনীবালা দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবির নিম্নের কবিতাটিতে আমরা যেন রবীন্দ্রনাথকেই প্রত্যক্ষ করি। --

হে অনাদি মহাকাল !

পাতনি তোমার

উদঙোৰা ৰহস্যৰ

ওৰনি মুখর।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কেবল কবিতার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়,সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রেও সমভাবে

অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুসরনে কবি পদ্মধর চলিহা অনেকগুলো গান রচনা করেছেন। --

ঢালাঁ কৃপাধারা প্রভু ঢাঁলা হে !

বোওয়া শান্তি নিজরা হে।

মোহর আন্ধার পরাজি সূরুযে

বিনাশে যেন পাপ-কলুষ প্রভু হে।

রত্নকান্ত বরকাকতি 'আলাপ'গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'নাটকের কবিশেখরের আদর্শে 'কবি বৈরাগীর'চরিত্র অঙ্কন করেছেন। গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'নাটকের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

কাব্যাস্বাদী এবং কবি বৈরাগীর কথোপকথন থেকে এর সত্যতা বোঝা যাবে। --

কাব্যাস্বাদী--ভাই তোমার কথা বিলাক মই নু বুজিলেও বাজি গৈছে হে।

কবি বৈরাগী--গৈছেনে বাজি ? কেনি ?....

কাব্যাস্বাদী --(কান লৈ দেখুৱাই)--কানৰ ভিতৰে দি সোমাই (বুক লৈ দেখুৱাই) ইয়াত বাজিছে হি।

অসমের গৌরীপুরের রাজার দেওয়ান দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ অসমের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। এই পরিবারেরই সুসন্তান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় কবিব্যক্তিত্ব। দ্বিজেন্শচন্দ্রের পত্নী অনিন্দিতা দেবী ছিলেন একজন সুলেখিকা। বঙ্গনারী ছদ্মনামে তাঁর বেশ কিছু রচনা বাংলার বেশ কিছু পত্র পত্রিকায় বিশেষ করে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। অমিয়চন্দ্রের দাদা অরুণ গৌরীপুর থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে আসে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অরুণ হঠাৎ কোনো রহস্যময় কারণে দার্জিলিং মেইলের চাকার নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আকস্মিক আঘাতে অমিয় তখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই শীর্ণ ,বিষণ্ন ছেলেটির মধ্যে অনন্য প্রতিভার স্ূরণ লক্ষ্য করে সবুজপত্রের সমপাদক প্রমথ চৌধুরী তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের এক বছর পরেই দাদা অরুণের আত্মহত্যা অমিয়কে একেবারে উদভ্রান্ত করে তোলে। অমিয়র এই মানসিক অবস্থার কথা শুনে প্রমথ চৌধুরীর মতো রবীন্দ্রনাথও উদ্বিগ্ন হন। প্রমথ চৌধুরী অমিয়কে এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের সংকল্পে রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন। কবি নিজেও তখন সংকটাপন্ন। তবুও তিনি অমিয়চন্দ্রকে সান্তনা জানিয়ে চিঠি লিখেন। ---'তুমি শান্তিনিকেতনে এসে আমার কাছে কিছুদিন থাক। নিজের মনটাকে বেশি প্রশ্রয় দিয়ো না। সুখ-দুঃখের খুব ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এ পর্যন্ত চলে এসেছি--কতবার হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু এইটাকেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি যে ,বেদনার ভিতর দিয়েই জীবনটা নিবিড়ভাবে পেয়েছি। বাঁচবার পথে যাত্রা কর কোমর বেঁধে--দুর্জয় তেজে অসীম আশায় ,অটল বিশ্বাসে। অশ্রদ্ধা কোরো না নিজেকে,এবং এই বিপুল সংসারকে --এই অপরিসীম রহস্যময় জীবলীলাকে। আপনার দীর্ঘ ছায়াটাকে আপনার চেয়ে সত্য মনে করে তুমি ব্যকুল হয়ে পড়েচ,এই কুহেলিকা থেকে ঈশ্বর

তোমাকে রক্ষা করুন,এই কামনা করি।' (চিঠিপত্র ১১,পঞ্চম চিঠি)

গৌরীপুরের প্রতাপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে ছাত্রাবস্থায় থাকার সময়েই অমিয়চন্দ্রের বহু বিদেশি লেখক ,চিন্তাবিদের সঙ্গে পত্রালাপ গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথও প্রথম বুঝতে পারেন নি যে পত্রলেখক একজন পনের বছরের বালক মাত্র। চিঠির ভাব ও ভাষা ছিল এতটাই গুরুগ ীর। তাই প্রথম চিঠির জবাব দিতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন 'বিনয় স াষণ পূর্বক নিবেদন'। সে যাই হোক,রবীন্দ্রনাথের মমতায় ভরা এই অসাধারণ চিঠি অমিয়চন্দ্রের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের পথনির্দেশ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কবি নরেশ গুহকে তিনি পরে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন--'প্লেটো বলেছিলেন আমরা গুহার ভিতরে আছি,অথচ জানি এই গুহাটা সব নয়। অপার্থিব আলোক চতুর্দিকে। 'আত্মগুহান্ধকারশায়ী'আমার বিশেষ অবস্থার বাহিরে রবীন্দ্রনাথ আমাকে আহ্বান করেছিলেন। (কবির চিঠি কবিকে,পৃ ১৩) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১ সনে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ পাশ করে পারিবারিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে করে কবির কাছে শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হন। ১৯২৬ সনে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব হয়ে পুনরায় শান্তিনিকেতনে কবির কাছে ফিরে আসেন। ১৯২৬ সনে ডিসেম্বর মাসে বিদেশ থেকে ফিরে আসার সময় প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ডেনমার্ক তনয়া হিয়রদিছ সিগর শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রমের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এর একবছর পর অমিয়চন্দ্রের সঙ্গে হিয়রদিসের বিয়ে হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন নামকরণ করেন 'হৈমন্তী'।

এবার আমরা অসমে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার ও প্রসার সমপর্কে দু একটি কথা বলতে চেষ্টা করব। আলোচনার প্রথমদিকেই আমরা বলেছি আবাহন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সমপাদক ডঃদীননাথ শর্মার কন্যা আরতি শর্মার বিয়ে হয় ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শিল্পরসিক সুভো ঠাকুরের সঙ্গে। এই দীননাথ শর্মারই সুযোগ্য পুত্র দিলীপ শর্মা--অসমের রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে একটি উজজল নক্ষত্র। ১৯৫১ -৫২ সনে গুয়াহাটির পানবাজারে স্থাপিত হয় হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকার শাখা কার্যালয়। কার্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন নীতীশ চক্রবর্তী। এই কার্য়ালয়ের নিয়মিত আড্ডায় গুয়াহাটির বিশিষ্ট রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীতপ্রেমী নীলকমল দত্ত,অমলেন্দু গুহ,ত্রিপুরেন্দু দাশগুপ্ত,অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,রবীন দে,নির্মল মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। ব্রহ্মপুত্রের তীরে আর্যনাট্য হলে এঁরা সবাই মিলে একটি আকর্ষণীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে এক ঘন্টার অসমিয়া লোকসঙ্গীত এবং এক ঘন্টার রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়। এর দায়িত্বে ছিলেন ভূপেন হাজরিকা এবং দিলীপ শর্মা। পরের বছর জীবন বীমা কার্যালয় ফ্যান্সিবাজার ওরিয়েন্টাল ভবনে দিলীপ শর্মার পরিচালনায় দেড় ঘন্টার একটি সঙ্গীতালেখ্যের আয়োজন করা হয়। সেখানে বর্তমানে ল প্রতিষ্ঠ নৃত্যবিদ গরিমা হাজরিকা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ তনয়া লিলি বরদলৈ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যপরিবেশন করেন। ৫০ এর দশকের শেষের দিকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকার কবির

রচনার একটি অনুবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে। কবি নবকান্ত বরুয়া অনূদিত 'চণ্ডালিকা'দিলীপ শর্মার পরিচালনায় গুয়াহটি বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুবাদে নবকান্ত বরুয়া ছাড়াও নীলিমা দত্ত,নির্মলপ্রভা বরদলৈ,কেশব মহন্ত,লক্ষহীরা দাস এবং নলিনীধর ভট্টাচার্য প্রমুখের বিশেষ ভূমিকা ছিল। শিল্পীরা ছিলেন দিলীপ শর্মা,মৃদুলা দাস,লক্ষহীরা দাস,সুদক্ষিণা শর্মা,অর্চনা মহন্ত,বীরেন্দ্রনাথ ,পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অনুবাদ করেন সাইয়াদুর রহমান। বেসরকারি উদ্যোগে এটি বহুবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৮ সনে এইচ.এম.ভির উদ্যোগে অসমিয়া ভাষায় দুটো রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করা হয়। তার একটি 'দিনবোর মোর সোনার সঁজাত'গেয়েছিলেন ভূপেন হাজরিকা এবং 'মই তোমাক যিমান শুনাইছিলো' দিলীপ শর্মা। বলাবাহুল্য বিশ্বভারতীর অনুমোদন নিয়েই এটা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে কৃষ্ণা দাশগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত 'সুদর্শনা',সুভাষ দে'র 'আনন্দধারা',বাণী সোমের 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারে ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'রক্তকরবী' নাটক আই পি টি এর শুধু গুয়াহাটি শাখাই একশো একবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিল। এই একটি ঘটনা থেকেই অসমবাসীর রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র অনুরাগী ও গবেষক ভবানন্দ দত্তের কথা না বললে আমাদের আলোচনা অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবির নিজবাসভূমে যখন রবীন্দ্র অনুরাগীদের চেয়ে রবীন্দ্রবিরোধীদের সংখ্যা এবং প্রতিপত্তিই বেশি তখন সুদূর অসমে বসে কবি ভবানন্দ দত্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রদীপটি পরম মমতা ভরে লালন করে চলছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভবানন্দের কণ্ঠে মন্ত্রোচারণের মতো ধ্বনিত হত। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি যারাই শুনেছেন তাঁরাই পুলকিত বোধ করেছেন। শ্রীদত্তের রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্র প্রতিভা'১৯৬০ সনে তাঁর মৃত্যুর একবছর পর প্রকাশিত হয়। এতে মোট নয়টি প্রবন্ধ রয়েছে। নানারকম সঙ্গীতে ভবানন্দের রুচি ছিল,তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র বঙ্গীয় কবি হিসেবেই দেখেন নি,সারা জীবন ধরে তিনি রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সত্বাকেই খুঁজে বেড়িয়েছেন,বলা বাহুল্য তা তিনি পেয়েছেনও। কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে স্বল্পায়ু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণের দিশারী।

অসমের বিভিন্ন চিন্তাবিদ ,লেখক লেখিকাদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চিন্তাবিদ হীরেন গোঁহাই ,লেখক হোমেন বরগোহাঞি,নিরুপমা বরগোহাঞি ,মামণি রয়সম গোস্বামী,তোষপ্রভা কলিতা,নলিনীধর ভট্টাচার্য ,নবকান্ত বরুয়া,প্রসেনজিৎ চৌধুরী ,শিবনাথ বর্মন এঁদের প্রত্যেকের লেখাতেই রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। অনেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে গ্রন্থ লিখেছেন। আজও রবীন্দ্রনাথ এঁদের অনেকেরই দৈনন্দিন জীবন চর্যার বিষয়। অসমের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রয়াত ইন্দিরা মিরি রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগিনী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতোই অসমেও একান্ত প্রিয়জনকে হারানোর

বেদনায় অসমের বৃহত্তর জনগন শোকে আপ্লুত হন। কবিপ্রযাণের খবর পরিবেশনে 'তিনদিনীয়া অসমীয়া'গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সমগ্র পৃষ্ঠা জুড়ে খবর বেরিয়েছিল --'জগৎ বরেণ্য বিশ্বকবির তিরোভাব ,কবি রবীন্দ্রনাথর মহাপ্রযাণ,আলোকসামান্য প্রতিভাদীপ্ত জীবনর অবসান।'মূল খবরের সঙ্গে মহাত্মাগান্ধী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল। শিলচর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সপ্তক' এর তৃতীয় এবং সপ্তম পৃষ্ঠা জুড়ে 'সপ্তকের প্রতি কবিগুরুর আশীর্বাদ,মৃত্যুর বিবরণ,কবির সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস এবং কবির প্রয়াণে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত শোকসভার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

কবির মৃত্যুতে অসমের প্রাণপুরুষ জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা 'অসমীয়া'র শিশুবিভাগ 'অকমানির চরা'ত শিশুদের আহ্বান করে একটি মর্মস্পর্শী আবেদন লেখেন--' ছোট ছোট শিশুরা ,তোমরা রবীন্দ্রনাথের কথা শুনেছ কি ? তাঁর লেখা অনেক গানও তোমাদের অনেকেই শুনেছ বোধহয় ? আমাদের দেশ ভারতবর্ষের বড় বড় কবিদের নাম তোমরা জান কি ? বাল্মীকির কথা জান কি ? যে মহাকবি সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লিখে রেখে গেছেন ? কালিদাস নামে একজন মহাকবির নাম শুনেছ কি ? শকুন্তলা নামে যিনি অনুপম একটি নাটক লিখে রেখে গেছেন। তোমরা বড় হলে কিন্তু এইসব লেখাগুলো পড়ে নেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনই একজন মহাকবি ছিলেন।...সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি কবিতাগুলো লিখেছিলেন। তাঁর কবিতা পড়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আনন্দিত হয়েছিল। ...তাঁকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ভালোবাসে,কারণ রবীন্দ্রনাথের গানে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রাণের গানটি শোনা গিয়েছিল। ...ছোটছোট শিশুরা ,এই রবীন্দ্রনাথকে তোমরা সবাই মনে রেখ। তাঁর বই,কবিতা বড় হলে খুঁজে নিয়ে পড়বে। তাঁর কথা সব সময় ভাববে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই প্রভাত সূর্যের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটি প্রণাম জানাবে। তোমাদের ছোট ছোট হৃদয়ে প্রতিভা স্থান করে নেবে। বড় হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বজগতে নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে। ' একই সঙ্গে এই পত্রিকায় তিনি 'রবীন্দ্রনাথ'শীর্ষক একটি কবিতা লিখেন। --

'হে কবি
হে রবি !--
যুগ যুগর
এই ভারতর
জীবন রহস্যান্বেষী --চিন্তা নিরত
অবসাদ ক্লিষ্ট --মহামান
তোমার কণ্ঠত পুনু লভিলে চেতন
অনন্তর অন্ত বিচরা
মুক্তি পিয়াসী

মহাভারতর প্রাণ...।

সমপ্রতি অসমের প্রসিদ্ধ সত্রীয় নৃত্যশিল্পী ডঃ মল্লিকা কন্দলী সত্রীয় নৃত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'ঝুলন' এবং 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে' গানটির সমন্বয় ঘটিয়ে গুয়াহাটি এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত নৃত্য প্রদর্শনীতে কবিগুরুর সার্ধ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ডঃ কন্দলীর এই অভিনব প্রয়াসকে রসিক সমাজ অভিনন্দন জানান।

১৯৯৫ সনের ৮ জানুয়ারি গুয়াহাটির সাংস্কৃতিক চক্রের আহ্বায়ক এবং সময় প্রবাহ পত্রিকার সমপাদক সুকুমার বাগচি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটক অবলম্বনে শ্রুতিনাটক করেন। গুয়াহাটির জিলা গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে এটি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক সাংস্কৃতিক চক্র,গুয়াহাটি। রাজা এবং নন্দিনীর ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে বাগচী মহাশয় এবং তাঁর কন্যা স্বরলিপি বাগচী। অন্যান্য চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন সুভাষ দে,অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়,কৃষ্ণা দাশগুপ্ত,সুভাষ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন পরিতোষ দেব। পরবর্তীকালে নঁগাও এবং তেজপুরেও এটি অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষ দে এবং পরিতোষ দেবের অকাল মৃত্যু অসমে রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চার ইতিহাসে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

এবার আমরা অসমিয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা অনুবাদের কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। যদিও অসমের সচেতন পাঠক সমাজ অন্যান্য লেখকদের মতোই রবীন্দ্রনাথ মূল বাংলাতেই পড়তে অভ্যস্থ তবুও সাহিত্য আকাদেমির প্রয়াসকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিভিন্ন দিকগুলো অনুবাদে অনেকেই এগিয়ে আসেন। এখানে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে হয়,বিশ্বভারতীয় নিয়ম কানুনের বিধিনিষেধ ব্যক্তিগত অনুবাদে রবীন্দ্র গ্রন্থ প্রকাশ এতিদন স ব হয়ে উঠে নি। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম,শিক্ষা,ইতিহাস,ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সংকলন 'নিবন্ধমালা খণ্ড ,১ ও ২ নামে সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন অসমের প্রথিতযশা লেখকবৃন্দ। 'রবীন্দ্র চয়নিকা' নামে একশ একটি কবিতা অনূদিত হয়ে সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক রত্নকান্ত বরকাকতী এবং নবকান্ত বরুয়া। বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের অনুবাদে 'একুরি এটা চুটি গল্প' প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক সাহিত্য আকাদেমি। দুই খণ্ডে সাহিত্য আকাদেমি থেকে 'সপ্তনাটক' প্রকাশিত হয়েছে। এতে রয়েছে বিসর্জন,চিত্রাঙ্গদা,চিরকুমার সভা,রাজা,ডাকঘর,মুক্তধারা,রক্তকরবী। অনুবাদকরা যথাক্রমে অতুলচন্দ্র হাজরিকা,বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া,সৈয়দ আব্দুল মালিক,মহেন্দ্র বরা,নির্মলপ্রভা বরদলৈ,নবকান্ত বরুয়া এবং কেশব মহন্ত। হেমেশ্বর দিহিঙ্গিয়া কবির 'গীতাঞ্জলি'অনুবাদ করেন। প্রকাশক লয়ার্স বুক স্টল। সাহিত্য আকাদেমি থেকে ১৯৬৩ সনে কেশব মহন্তের অনুবাদে 'যোগাযোগ',১৯৬৫ সনে সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরীর অনুবাদে 'গোরা',১৯৬৮ সনে মহেন্দ্র বরার অনুবাদে 'বিনোদিনী' (মূল উপন্যাস চোখের বালি),২০০৫ সনে পরাগকুমার ভট্টাচার্যের অনুবাদে 'ঘরে বাইরে'প্রকাশিত হয়। ১৯৫১ সনে শিলঙের চপলা বুক স্টল থেকে উমাকান্ত শর্মার অনুবাদে 'রাজর্ষি'প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক বিভূভূষণ চৌধুরী। হংসনাথ ভট্টাচার্যের অনুবাদে এই চপলা বুক স্টল থেকেই ১৯৫০ সনে গল্পগুচ্ছের অনুবাদ

বেরিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা যেতে পারে যে একসময় শিলঙের এই চপলা বুক স্টল বাংলা বই পত্র প্রকাশনা ও প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সামপ্রতিককালে সাহিত্য আকাদেমির পাশাপাশি স্থানীয় প্রকাশকরাও পাঠকের চাহিদার কথা মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদে এগিয়ে এসেছেন। এরই ফলে 'বনলতা 'থেকে নাজমা মুখার্জীর অনুবাদে 'শেষের কবিতা',পূর্বাঞ্চল প্রকাশনা থেকে নিশিপ্রভা ভূঞার অনুবাদে 'মালঞ্চ'প্রকাশিত হয়েছে। খুব শীঘই দীপিকা চক্রবর্তীর অনুবাদে সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হতে চলেছে 'গোরা' উপন্যাস।

২০০৬ সনে প্রকাশিত অসমের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং প্রবান্ধিক প্রসেনজিৎ চৌধুরীর 'অন্য এক রবীন্দ্রনাথ' সামপ্রতিক কালের অসমে রবীন্দ্র চর্চার ইতিহাসে এক মূল্যবান দলিল স্বরূপ। ২০০১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে লয়ার্স বুক স্টল থেকে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ আরু অসম' গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন স্বরূপ। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমপর্ক বুঝতে হলে এ গ্রন্থ অপরিহার্য। গ্রন্থটি রচনায় লেখক যে ধরনের তথ্যনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের মুগ্ধ করে। বিভিন্ন সময়ে দেশের সুধীমহল কর্তৃক বইটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমরা অনেকেই জানি লেখক কর্তক বইটির একটি বাংলা সংস্করণও বেরিয়েছে। শুধু তাই নয় কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তক বইটি পুরস্কৃত হয়েছে।

শিলঙের সঙ্গে কবির নিবিড় যোগাযোগ ছিল। কবি ১৯১৯ সনে প্রথম শিলঙ যান। শহর থেকে দূরে রাইবঙের ব্রুকসাইড কমপাউণ্ডে ছিলেন। এরপর ১৯২৩ সনে দ্বিতীয়বারের জন্য শিলঙ যান এবং জীতভূমিতে মাসাধিক কাল বসবাস করেন। তৃতীয় এবং শেষবার যান ১৯২৭ সনে। 'শেষের কবিতা'উপন্যাসে লেখক শিলঙ শহরকে অমর করে রেখেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের ১৭টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ১৩টি পরিচ্ছেদের পটভূমিই হল শিলঙ। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রাথমিক রূপ যক্ষপুরীর খসড়া এই শিলঙ শহরেই রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১৯২৩ সনে কবির শিলঙে বসবাস করার সময় কিছুকাল শিলঙ ছিলেন। রাধাকমল বাবু বোম্বাই শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের স্বচক্ষে দেখা দুর্দশার কথা কবির সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তখন জানতেও পারেন নি যে কবির সঙ্গে এই আলোচনাই পরবর্তীকালে রক্তকরবী নামে একটি মহান নাটকের জন্ম দেবে। 'শিলঙের চিঠি' কবিতায় কবি লিখেছেন---

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ- নামক পর্বতে ।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে।
ক্লান্তজনে ডাকদিয়ে কয় ,'কোলে আমার শরণ নে।'

উত্তর পূর্বাঞ্চলের আরো একটি রাজ্য মণিপুরের সঙ্গেও কবির খুব ঘনিষ্ঠ সমপর্ক গড়ে উঠেছিল। আমরা সকলেই জানি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্যের প্রচলনের ব্যাপারী খুব উৎ সাহী ছিলেন।

'চিত্রাঙ্গদা'চরিত্র রূপায়নের মাধ্যমে কবি মণিপুরকে অমরতা দান করেছেন।

গুয়াহাটির Assam Academy for Cultural Relations উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদের কার্যসূচি গ্রহণ করে। তারই ফলস্বরূপ আমাদের হাতে আসে খাসি ,গারো ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ। অনুবাদকদ্বয় মিসেস এস্থার নোরা লনডন এবং উইলসন মারাক। ডঃ ডি এস রঙ্গমুথু লীলা মজুমদারের লেখা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বইটি গারো ভাষায় অনুবাদ করেন। ডঃ বিনোদবিহারী রায় বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত খাসিভাষায় অনুবাদ করেন। বেশ কয়েকবছর ধরে হাফলঙের যতীন্দ্রলাল থাওসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ডিমাসা ভাষায় অনুবাদ করে চলেছেন। অধ্যাপক টাবু টাইড মিসিং ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান অনুবাদ করে সত্তরের দশকে সেগুলো আকাশবাণীর মাধ্যমে পরিবেশন করেছিলেন।

এভাবেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আজও এই অঞ্চলের অনেক শিল্প সাহিত্যিকদের জীবনেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনের জীবনচর্যার বিষয়। তাঁদের রবীন্দ্রনাথ ২৫ শে বৈশাখের সৌখিন রবীন্দ্রচর্চায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার ভাবতেও ভালো লাগছে যে আজ আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই এসে এই আনন্দ উৎ সবে মিলিত হয়েছি ,এবং তা রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই ,সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সমস্ত মানুষকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন,স্বপ্ন দেখেছিলেন এক বৃহত্তর মানবজাতির। আসুন না, আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভাইবোনেরা পরস্পরেরর মধ্যে সমস্ত রকম ভাষাগত ,জাতিগত,ধর্মগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হই । সে মন্ত্র পাণ্ডিত্যের কচকচি নয়,ধর্মের দরকাষাকষি নয়,সে মন্ত্র ভালোবাসার মন্ত্র।

পরিশেষে ত্রিপুরার অগণিত ভাই বোনদের আমি জানাই আমার প্রাণভরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। একদিন এই ত্রিপুরাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কবি প্রতিভার সর্বপ্রথম স্বীকৃতি জানিয়েছিল,ভৌগোলিক দূরত্বও সেই স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সেই যুগে কোনোরকম বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী আজকের ত্রিপুরাবাসীরাও রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে জনমানসে ছড়িয়ে দিতে যত্নবান হবেন। নমস্কার।

ঋণ স্বীকার : --

১) রবীন্দ্র জীবনকথা --প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২) রবীন্দ্রনাথ ও অসম ---উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

৩) একা এবং কয়েকজন পত্রিকা --শরৎ সংখ্যা ১৪০৫

৪) ঐ --শরৎ সংখ্যা ১৪০৬

৫) রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য --সুধাকর চট্টোপাধ্যায়